স্থাপত্য

মুঘলরা মহান দুর্গ ও প্রাসাদ, অতিসুন্দর তোরণ (দরওয়াজা) এবং জনসাধারণের ব্যবহারে জন্য নির্মিত সরাই, হামাম (স্নানঘর), মসজিদ, বাওলি (জলাধার) ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁরা বহমান জল সহ বহু প্রথাগত উদ্যান রচনা করেন। বিশেষ করে মুঘলেরা তাঁদের প্রাসাদে এবং বিলাস গৃহগুলিতেও সদাসর্বদা জল পাওয়ার ব্যবস্থা রাখতেন। বাবর বাগান খুবই ভালোবাসতেন এবং আগ্রা ও লাহোর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বাগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাদের মধ্যে কাশ্মীরে নিশাত বাগ, লাহোরে শালিমার বাগ, কালকায় পর্বতের পাদদেশে পিনজোর উদ্যান, আগ্রার সন্নিকটে আরাম বাগ (যার বর্তমান নাম রাম বাগ) ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র আজ অবশিষ্ট আছে। উঁচু জমিতে করা এই সব বাগান থেকে উদ্যান শিল্প সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের এক সুন্দর নান্দনিক রুচি ছিল, যদিও তিনি ভারতে অনেকগুলি অট্টালিকা নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি। এবং তাঁর

Scanned with CamScanner

নির্মিত বেশিরভাগ গৃহই আর অবশিষ্ট নেই। বাবরের নিকট শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যই ছিল স্থাপত্যের মুখ্যতম বস্তু, যা ভারতের বেশিরভাগ গৃহই পাননি। সম্ভবত দিল্লি, আগ্রা এবং লাহোরে লোদিদের নির্মিত গৃহগুলি দেখেই তাঁর অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। অযোধ্যা এবং সম্ভলের যে মসজিদগুলি তাঁর দ্বারা নির্মিত বলে কথিত আছে, সেগুলি আসলে সেখানে পূর্বে নির্মীত ভবনের পরিবর্তন করে নির্মীত এবং তার থেকে বাবরের স্থাপত্য-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

তবে সেই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলি নিঃসন্দহে সাসারাম এবং দিল্লিতে শের শাহ্ নির্মাণ করেছিলেন। সাসারামের নির্মাণগুলি কয়েকটি স্মৃতি-সৌধের সমষ্টি, যা দিল্লির অষ্ট-কোনাকৃতি লোদিদের সমাধির ধরনে নির্মীত। তবে সাসারামের সব স্থাপত্যের মধ্যে শের শাহের সমাধিকেই সর্বোত্তম বলা যায়। একটি বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যভাগে নির্মিত এই অট্টালিকাটির প্রতিবিম্ব সঞ্চরণের ভ্রম সৃষ্টি করে, মনে হয় যেন এটি চলমান, আবার সেই সঙ্গে এর আয়তনও দ্বিগুণ বলে মনে হয় (পার্সি ব্রাউন)। এই বিশাল অষ্টকোনা সৌধটি একটি উচ্চ বর্গাকার বেদীর উপর স্থাপিত হওয়ার জন্য এর উচ্চতা এবং বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বেদীটি আবার মূল সৌধটির সঙ্গে কোনায়-কোনায় কয়েকটি সুঠাম চাতালের দ্বারা সংযুক্ত। এই ভবনের চারপাশ বেষ্টন করে যে খিলান আকারে বাঁকানো বারান্দাটি এবং ধাপে ধাপে উত্থিত বিশাল গম্বুজটি এর মধ্যে এক উচ্চ সমতলের ভাব এনে দিয়েছে। গম্বুজের কণ্ঠদেশ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত যার উপর কয়েকটি সুষমামণ্ডিত বেদী আছে। বিশাল গম্বুজটির উপরে একটি পদ্মফুলাকৃতি বিশিষ্ট ঢাকা আছে। লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে শের শাহের স্মৃতিসৌধের বহু স্থাপত্যকর্মই কিছুটা পরিবর্তন করে তাজমহলে সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাজমহলের স্থাপত্যকে যেমন লঘু, কোমল এবং বায়ুময় মনে হয়, তেমনি শের শাহর স্মৃতিসৌধ এক শক্ত এবং সুগঠিত, সবল স্থাপত্যময়। এইগুলি আবার স্থাপত্যশিল্পের প্রয়োজনীয় অংশ এবং শের শাহের চরিত্রের সঙ্গেসামঞ্জস্য পূর্ণ।

শের শাহ দ্বারা নির্মিত 'পুরানা কিল্লা' বা পুরাতন দুর্গ হয়তো হুমায়ুনের জাঁহাপনার অংশ। এটি একটি বিরাট পুরাকীর্তি যার দেওয়ালগুলি ধূসর রঙের পাথরের দ্বারা প্রস্তুত। এর দর্শনীয় তোরণটি লাল বালিপাথরের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর দিয়ে সজ্জিত এবং মধ্যে মধ্যে সবুজ স্ফটিক বসানো। শেরশাহ নির্মিত কোনো প্রাসাদ বা জন ভবন আজ অবশিষ্ট নেই। কিল্লার বাইরে খায়ের-উল-মজলিস নামক সম্মিলিত মসজিদ ও মাদ্রাসা ১৫৬১ সালে মাহাম আনাগা নির্মাণ করেছিলেন। এর একটি চমৎকার তোরণ আছে। এই দুর্গের মধ্যে একমাত্র যে

Scanned with CamScanner

স্থাপত্যটি এখনও অক্ষত আছে সেটি একটি রাজকীয় উপাসনা গৃহ, যার নাম কিলা-ই কুহনা-মসজিদ। এর প্রধান গঠন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মনোহর সম্মুখভাগ যেখানে পাঁচটি চমৎকার পরিমাপ সম্পন্ন পাঁচটি খিলান-যুক্ত প্রবেশ পথ আছে। এই প্রতিটি তোরণ আবার একটি আয়তাকৃতি কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। কেন্দ্রীয় তোরণটি তার দুই পাশের তোরণগুলির থেকে বৃহত্তর। মধ্যেকার তিনটি খিলান-যুক্ত তোরণে সুন্দর পক্ষী-শোভিত জানালা আছে যেগুলি রাজস্থান শৈলীর স্থাপত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এর অন্যান্য সাজসজ্জা কিন্তু সাধাসিধা। সাদা পাথর বসানো এবং যার মধ্যে মধ্যে রঙিন স্ফটিক দিয়ে সজ্জিত। মসজিদের মধ্যেকার তোরণের দুই পার্শ্বে এবং পিছনের দেওয়ালের কোণে সরু বুরুজগুলি স্থাপত্যটির শক্তি বাড়ায়, আকবর লোদিদের ধরনে নির্মিত একক ছাদটির সন্তুলনও রক্ষা করে।

এই হর্ম্যগুলিকে লোদি গৃহনির্মাণ শিল্পের শেষ পর্যায় এবং একটি নতুন শৈলীর প্রাথমিক স্তর বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আকবরের সময় থেকেই প্রকৃত মুঘল স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বলা যায়। বৃহৎ পরিমাণে নির্মাণ শিল্প পরিচালনা করার মতো সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ছাড়াও গৃহনির্মাণ কার্যে তিনি স্বয়ং উৎসাহী ছিলেন। আকবর ব্যক্তিগত ভাবে বহু নির্মাণ কার্যের তদারকি তো করতেনই এমনকি সময় সময় সেই কাজে হাতও লাগাতেন। সর্বোপরি, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপত্য শিল্পের যেসব সূক্ষ্ম ঐতিহ্য বর্তমান ছিল, সেগুলিকে একত্রিত করাই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা।

আকবরের সময় দুইটি বিভিন্ন শৈলীর স্থাপত্যকর্ম একসঙ্গে দেশে প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল পারসিক ঘরানা, শাহ তাহমাসপ-এর দরবারে যার সঙ্গে হুমায়ুনের পরিচয় হয়। হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধে এই পারসিক ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বিধবা পত্নী হাজী বেগম সম্ভবত ১৫৬৪ সালে এর নির্মাণ শুরু করেন, যা সম্পূর্ণ হতে আট বৎসর কাল সময় লেগেছিল। এই বর্গাকার লাল বালিপাথরে নির্মিত সৌধটি একটি উচ্চ বেদীর উপর নির্মিত হয় এবং এর শীর্ষে সুন্দর সীমারেখা বিশিষ্ট শ্বেতপাথরের একটি গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজটির কণ্ঠদেশ বা গলা একটু সরু কিন্তু গম্বুজটি উর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়েছিল। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক এস. কে. সরস্বতীর মতে এটি তৈমুরীয় স্থাপত্য থেকে একেবারে নকল না করা হোক, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পারসি ব্রাউনের মতে 'এটি একটি পারসিক চিন্তার ভারতীয় রূপায়ণ।' সিকান্দার লোদির কবরের উপর যে জোড়া গম্বুজ দেখা যায়, ভারতে নির্মিত পারসিক স্থাপত্যের সেইটি প্রথম নিদর্শন হলেও, তখনও সেই

Scanned with CamScanner

শিল্পের ব্যবহার এদেশে পরিণত হয়ে ওঠেনি, অবশ্য পশ্চিম এশিয়ায় এই ধারা দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত ছিল। জোড়া গম্বুজ আকাশের গায়ে এক সুন্দর রূপরেখা এঁকে দিত এবং অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠের উপর এই ভিতরের ছাদটি যথেষ্ট মানানসই মনে হত।

পারসিক স্থাপত্যের দ্বিতীয় প্রভাব দেখা যায় গৃহের ভিতরে কক্ষগুলির বিন্যাসের মধ্যে। ভিতরে একটি ঘেরা জায়গার পরিবর্তে অনেকগুলি কক্ষ বারান্দার ধারে পর পর নির্মাণ করা হত এবং সেগুলি যাতায়াতের পথ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকত। তবে পূর্বেকার তুরস্কের গৃহগুলিতেও এই ধরনের বন্দোবস্ত দেখা যেত।

ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে বলতে গেলে সমগ্র ভবনটিই বেশ বড়ো তোরণ সমেত একটি যথাযথ বাগানের মধ্যে নির্মিত হত। গম্বুজটি কতকগুলি হালকা মিনারের উপরে গুজরাট ঘরানার অনুসরণ করে স্থাপিত হত। আবার মনোরম দালানগুলিই ছিল রাজস্থানী ঘরানার বৈচিত্র্য। চারদিকেই নির্মিত খিলানগুলি এবং সুন্দর সাদা পাথরের কাজ গৃহটিকে আরও মনোরম করে তুলত।

দিল্লিতে যখন হুমায়ুনের সমাধি নির্মিত হচ্ছিল, তখন আকবর আগ্রাতে সেই মহান দুর্গটি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ২৬ মাইল (৪২ কি.মি) দূরে সিক্রিতে একটি নূতন শহর ও প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপনও করছিলেন। ১৫৬৫ সালে শুরু হয়ে আগ্রার দুর্গ আট বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। আগ্রার দুর্গের বিশাল গুলি চালাবার ছিদ্র সমন্বিত প্রাচীর, যুদ্ধ করার উপযুক্ত দেওয়াল, লাল বালিপাথরের তৈরি দুটি পরস্পর সংযুক্ত আটকোনা মিনার সমন্বিত প্রবেশদ্বার ইত্যাদি সম্বন্ধীয় যে গঠনশৈলী, পরবর্তীকালে আকবর লাহোর, আজমীর, এলাহাবাদ ইত্যাদি শহরে কেল্লা বানাবার সময় সেই স্থাপত্যই প্রয়োগ করেছিলেন। শাহজাহানের দ্বারা নির্মিত দিল্লির লালকেল্লাও আগ্রার দুর্গের ধরনেই গঠিত। আবুল ফজলের বক্তব্য অনুযায়ী আগ্রা কেল্লার অভ্যন্তরে আকবর বাংলা এবং গুজরাটের নির্মাণশৈলী অনুসারে লাল পাথরে গড়া পাঁচশোটির অধিক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। যদিও নিজের মতো করে স্থাপত্য নির্মাণ করার জন্য শাহজাহান এই সমস্ত অট্টালিকার অধিকাংশকেই ধ্বংস করেছেন, তথাপি আকবরি মহল ও জাহাঙ্গিরি মহলের যে অংশটুকু এখনও আছে, তা থেকে আমরা আকবরের নিজস্ব স্থপতি শিল্পের কিছুটা অনুমান পাই। এই সমস্ত প্রাসাদের অধিকাংশরই ছাদ সমতল এবং কয়েকটি সুন্দর কারুকার্যময় স্তম্ভ এর ভার বহন করত। শোনা যায় যে গোয়ালিয়র দুর্গের মানমন্দিরের ধরনে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল এবং রাজস্থানী নির্মাণের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। যথা ভারী ও শক্তিশালী বালি-পাথরের বন্ধনী এবং ময়ূর ও সর্পের

Scanned with CamScanner

নকশা-সমন্বিত বারান্দা। দেওয়ালে এবং সিঁড়ির উপরে হাঁস, ফ্ল্যামিঙ্গো, পদ্মফুল—এছাড়া কিছু কল্পকাহিনির পশুপক্ষী যেমন ডানাওয়ালা ড্রাগন, অর্ধেক হাতি, পাখি ইত্যাদির রূপ খোদাই করা আছে।

সিক্রির বিশাল স্থাপত্য, গুজরাটে যুদ্ধ জয়ের পর যার নামে ফতেপুর রাখা হয়েছিল, তার নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৫৬৮-৬৯ সালে, যখন কাচ্ছাওয়াহা বেগম সেলিমকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এর পরবর্তী ১৫ বৎসরে বহু রাজপ্রাসাদ এবং জনগৃহ এখানে নির্মিত হয়। এই সমগ্র উপনগরী একটি কৃত্রিম হ্রদের পাশে একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়েছিল। নীচেকার সমতল ভূমিতে নির্মিত একটি দেওয়াল সমগ্র প্রাসাদ নগরীটিকে বেষ্টন করে রেখেছিল, যেখানে বেশিরভাগ গৃহই আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইসব বিষয় ভালো করে লক্ষ না করেই পারসি ব্রাউন এই প্রাসাদভিত্তিক উপনগরীটিকে একটি শহর বলে ভুল করে বলেছিলেন, 'এই শহরে যথাযথ নগর পরিকল্পনার কোনো নিদর্শন নেই।' এস. কে. সরস্বতীও এই একই ভুল করেছিলেন।

তিন খিলান-সমন্বিত একটি তোরণ দিয়ে এই প্রাসাদ নগরীতে প্রবেশ করতে হয়। যার নাম *নওবত খানা*। তারপর ডানদিকে অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাদশাহের কারখানা এবং টাকশালকে রেখে, এক বিশাল চত্বরে পৌঁছানো যায় যার নাম *দিওয়ান-ই-আম*। *দিওয়ান-ই-আম*-এর পেছনে ডান অর্থাৎ পশ্চিম দিকে গেলে একটি প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হবে যাকে লোকে *দিওয়ান-ই-খাস* বলে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা মতে এটি প্রকৃতপক্ষে তামা, রুপা ও সোনার মুদ্রার তোষাখানা সমেত অনেকগুলি প্রাসাদের সমষ্টি। এই সব প্রাসাদের অনেক অংশ ভেঙে পড়েছে বা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর পাশের বাড়িটি, মানুষজন যাকে *আঁক-মিছাউনি* (লুকোচুরি) বলে, সেটিও তোষাখানারই একটি অঙ্গ বলা যায়।

দিওয়ান-ই-আম-এর পশ্চাতে একটি বিশাল চত্বরের পরেই যে দোতলা প্রাসাদটি দেখা যায় সেটি ছিল দৌলতখানা রাজপ্রাসাদ। এর একতলার ঘরগুলিকে গোপন মন্ত্রণাগৃহ বলা হয়। দোতলায় একটি অত্যন্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে যেখানে আকবর দুপুরে বিশ্রাম করতেন, বা তাঁকে সেখানে বই পড়ে শোনানো হত। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট গৃহগুলি থেকে রাজপ্রাসাদকে আড়ালে রাখবার জন্য একটি দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, যা অবশ্য আজ ভেঙে গেছে। সম্রাটের প্রাসাদের সামনেই ছিল অনুপ তালাও যার মধ্যিখানে একটি বেদী নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে এবং নীচেরতলার ঘরগুলিতে আকবর মাঝেমধ্যে দার্শনিক তর্কসভা বসাতেন বা গানের আসরের আয়োজন করতেন। এখানেই দার্শনিকেদের একটি

Scanned with CamScanner

খাটে বসানো হত, যেখান থেকে তাঁরা আলাপ আলোচনা করতেন। অনুপ তালাওয়ের এক কোণে লাল বালিপাথরে তৈরি একটি ছোটো বর্গাকৃতি গৃহ ছিল যার দেওয়ালগুলি ছিল এত সুন্দর কারুকার্যময় যে দেখে মনে হত সেটি যেন কাঠের তৈরি। এটিকে তুর্কি সুলতানার গৃহ বলা হলেও, সেই নামকরণ ছিল অবশ্যই ভুল—কেননা কোনো রাজকুমারী এত আব্রুহীন ঘরে থাকতে পারেন না। সম্ভবত এটি বিশিষ্ট অতিথিদের বিশ্রামস্থল ছিল, রাজকীয় হারেম বা মহিলামহল ছিল বাদশাহের প্রাসাদের এক পাশে। এর একটি স্বতন্ত্র রক্ষীগৃহ ছিল এবং একটি সুউচ্চ দেওয়াল সাধারণ গৃহগুলি থেকে একে আড়াল করে রাখত। সেই দেওয়ালটিও অবশ্য আর নেই। প্রাসাদের আরও পশ্চাতে জামা মসজিদের নীচে সমতলভূমিতে অবস্থিত শহর থেকে সোজাসুজি আসা যেত।

সুতরাং এই প্রাসাদনগরী পরিকল্পনা মাফিকই রচিত হয়েছিল। কৃত্রিম হ্রদের জল তুলে ব্যবহারের জন্য এবং ফোয়ারার জন্য ব্যবহৃত হত। সিক্রি প্রাসাদটিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ গৃহগুলি সর্দল (লিনটেল)-এর উপর নির্মিত। হারেম-এর মধ্যবর্তী একটি প্রাসাদকে যোধাবাইয়ের প্রাসাদ বলা হয়, যদিও যোধাবাই আকবরের স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন পুত্রবধূ। সম্ভবত এই প্রাসাদে বাদশাহের হিন্দু স্ত্রীরা বাস করতেন। এই বৃহদাকার প্রাসাদটিতে একটি বড়ো চত্বরের চারিদিকে কিছু কিছু ঘরের একটি করে সমষ্টি নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি গৃহনির্মাণের পরম্পরা যা সাম্প্রতিক কালেও অনেক গৃহে প্রচলিত ছিল। এর ভূমি, স্তম্ভ এবং কারুকার্যময় উপরিভাগ সবই ছিল মন্দিরের স্তম্ভগুলির পরম্পরায় নির্মিত। এছাড়া এটি উপাসনা বা পূজাকক্ষও ছিল।

হারেম গৃহমণ্ডলীর মধ্যে আরও তিনটি গৃহ লক্ষণীয়। প্রথম প্রাসাদটিকে ভ্রমবশত বীরবলের প্রাসাদ বলা হয়। এই দোতলা বাড়িটির একতলার প্রবেশের ঢাকা পথটি নীল চতুর্ভুজাকৃতি স্ফটিকের দ্বারা শোভিত। আধুনিক সমালোচক এস. কে. সরস্বতীর মতে এটি বাসগৃহের একটি অপূর্ব নিদর্শন। এর পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও সমতা অতুলনীয়। এর গঠনমূলক এবং শোভাবর্ধক উপাদানগুলি একে অন্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে সমযোজী।

দ্বিতীয়টি হল সালিমের মাতা, কাচ্ছাওয়াহা রাজকুমারীর ছোটো অথচ অতীব সুসজ্জিত প্রাসাদ। এই মহিষীকে *মরিয়ম-উজ-জামানি* বা (পৃথিবীর মেরি বলে ডাকা হত)। এই কথাটি বহুদিন থেকেই বিশেষ অর্থবহ। এইসব ঘরের অভ্যন্তর ভাগ ছিল বৃহৎ সুন্দর দেওয়াল চিত্র দ্বারা সুশোভিত। যাদের মধ্যে অনেকগুলিই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বন্ধনীর উত্তরদিকে রাম এবং তাঁকে পূজারত হনুমানের

Scanned with CamScanner

একটি মূর্তি খোদাই করা আছে। অন্য বন্ধনীগুলিতে হংস, হস্তী ইত্যাদির মূর্তি দেখা যায়। গোঁড়ার কাছে যেগুলি ছিল অভিশপ্ত বস্তু।

তৃতীয় প্রাসাদটি হারেম গৃহসমষ্টির ঠিক ভিতরেই স্থাপিত এবং এর নাম পাঞ্চমহল। কিন্তু সাধারণ গৃহগুলির সঙ্গে এর মধ্যকার দেওয়ালটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটি একটি পাঁচতলা গৃহ যার ছাদটি ক্রমশ পিছনের দিকে সরে গেছে এবং প্রতি স্তরেই সুন্দর কারুকার্য-মণ্ডিত স্তম্ভগুলি সেই অংশের ছাদটিকে ধরে রেখেছে। প্রতিটি স্তম্ভের অলংকরণ আবার পৃথক ধরনের। বহিরাগত সকলে বিদায় নিলে হারেমের মহিষীগণ এইখানেই মুক্ত হাওয়ায় বিশ্রাম নিতেন। যেসব শ্বেতপাথরের জাফরি মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত লর্ড মেয়ো ১৮৯০ সালে 'শোভাবর্ধনের' জন্য সেগুলিকে ভেঙে দেন।

এই গৃহগুলি সৃজনমুখী এবং পরীক্ষমূলক স্থাপত্য ছিল বলে বোঝা যায়। এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে গৃহের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশকে *দিওয়ান-ই-খাস*, যা এখন রত্নগৃহ বলে পরিচিত। এটি একটি একক কক্ষ যার মধ্যে একক বৃহৎ এবং শক্তিশালী স্তম্ভ একটি বৃত্তাকার পাথরের মঞ্চকে ধরে রেখেছে। এই কেন্দ্রীয় মঞ্চ থেকে কয়েকটি পাথরের সেতুপথ ঘরের চারদিকে নির্গত হয়ে উপর থেকে ঝুলন্ত আসলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নানা প্রকার অলংকরণে সমৃদ্ধ যে মধ্যবর্তী স্তম্ভটি তৎসংলগ্ন বন্ধনীগুলি সহ কেন্দ্রীয় মঞ্চটিকে ধরে রেখেছিল সেটি একটি কাষ্ঠনির্মিত গুজরাটি স্তম্ভের প্রতিরূপ। এখানেও কল্পকথার প্রাণীদের ছোটো ছোটো মূর্তি খোদাই করা দেখা যায়।

সিক্রির সবথেকে সম্ভ্রম উদ্দীপক স্থাপত্যটি হল জামা মসজিদ। এই মসজিদের একটি অস্বাভাবিক বৃহৎ চত্বর আছে। এর পুণ্য কক্ষটির কয়েকটি খিলান-যুক্ত প্রবেশপথ ছিল, গৃহটির সমগ্র কার্নিশ বরাবর ছিল স্তম্ভস্থাপিত চাতালসহ অনেকগুলি গম্বুজ এবং চত্বরে একটি খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পায়ে চলা পথ, যেখানে বিভিন্ন ধরনের স্তম্ভ এবং অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। পারসিব্যারন বলছেন, 'অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে এই পুণ্যস্থানটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করা হয়েছে, তাই থেকে এই মসজিদটি তার সুন্দর নিজস্বতা লাভ করেছে।' এই চত্বরেই সুন্দরভাবে নির্মিত পাথরের জাফরিসহ মহাত্মা শেখ সেলিম চিস্তির কবর আছে। বাইরের দিকের শ্বেতপাথরের বারান্দাটি শাহজাহান পরে নির্মাণ করেন।

মসজিদের একদিকে একটি বিশাল তোরণ সোপানশ্রেণির সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই সেই বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজা (সুউচ্চ তোরণ) যা ১৫৭৩ সালে গুজরাট জয়ের পর আকবর নির্মাণ শুরু করেন। এই তোরণটি অর্ধগম্বুজাকৃতি প্রবেশ পথের একটি

Scanned with CamScanner

নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে একটি গম্বুজকে দ্বিখণ্ডিত করে নির্মাণ করার ফলে গম্বুজের খণ্ডটি তোরণের বিশাল বর্হিমুখী সম্মুখভাগের রূপ ধারণ করেছে। আবার পেছনের দেওয়ালে যেখানে গম্বুজ মেঝের সঙ্গে মিশেছে সেখানে ক্ষুদ্রতর দরজাগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। ইরান থেকে সংগৃহীত এই স্থাপত্যটি ভবিষ্যতে অন্যান্য মুঘল প্রাসাদে ব্যবহৃত হয়েছে। তোরণের সম্মুখভাগের নীচু দেওয়ালটির উপর অনেকগুলি ছোটো গম্বুজ সহ ছত্রি ছিল এবং সেই গম্বুজগুলি আকাশরেখাকে যেন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে দিচ্ছিল। এই বিশাল তোরণটি অবশিষ্ট প্রাসাদটিকে অনুপাত বহির্ভূত ভাবে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করে দেওয়া সত্ত্বেও ফতেপুর সিক্রি একটি অতি চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য—যা মনে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করে।

সাম্রাজ্য ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল স্থাপত্য তার চরম উৎকর্ষে পৌঁছায়। জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে শ্বেতপাথরের তৈরি প্রাসাদ সৃষ্টির ব্যবস্থা শুরু হয়। এইসব গৃহের দেওয়ালগুলি আবার বহুমূল্য পাথর দিয়ে প্রস্তুত ফুলের নকশা দিয়ে সুশোভিত করা হত। এই ধরনের অলংকরণ, যাকে বলা হত 'পিএট্রা ডিউরা', জাহাঙ্গিরের সময়ে নির্মিত ইতমাদ-উদ-দৌলার ছোটোখাটো সমাধিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ধরনের আয়তাকার গৃহের বিশেষ অনুষঙ্গ ছিল গৃহের চারকোণে সুন্দর গম্বুজ সম্পন্ন আটকোনা মিনার। আকবরের নিজের সমাধির সূত্রপাত তিনি নিজে করলেও শেষ অবশ্য জাহাঙ্গির করেছিলেন। সেই সমাধিতে কোনো গম্বুজ ছিল না, কেবল সমতল ছাদের উপর একটি ছোটো খিলানে ঢাকা পথ ছিদ্রযুক্ত নানারঙের পর্দার দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল।

নির্মাণ শিল্পের রত্ন বলে বিবেচিত তাজমহলের মধ্যে স্থাপত্যশৈলীর যেসব ধারা মুঘলরা অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত নিজেদের করে নিয়েছিল সেসবই অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্মৃতিসৌধটিকে যথাযথ ভাবে নির্মিত উদ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই উদ্যানে ফোয়ারা আছে। আছে স্রোতস্বিনী জলপ্রবাহ। সমাধি গৃহটিকে দৃঢ়তা প্রদান করার জন্য একটি উঁচু বেদীর উপর এটিকে স্থাপন করা হয়েছে, যার জন্য আকাশের পটভূমিকাটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সর্বশেষে অর্ধ গোলাকৃতি প্রবেশ পথটি সমাধিসৌধের ভিতরে আসার ব্যবস্থাটিকে সুন্দর করে তোলে। তবে বিশাল গম্বুজটি এবং বেদী বা মঞ্চটিকে মূল গৃহের সংযোগ-রক্ষাকারী চারটি লম্বা ও কৃশ মিনারকেই একযোগে তাজমহলের মুখ্য গৌরব বলা যায়। সৌধের অঙ্গসজ্জাকে যথাসম্ভব

Scanned with CamScanner

সীমিত করে রাখা হয়। কেবল হালকা শ্বেত জাফরি পিএত্রা ডিউরা খোদাই কর্ম এবং ছত্রিগুলিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

তাজমহল দেশের রাজকীয় স্থাপত্যশিল্পের যুক্তিসঙ্গতভাবে গড়ে ওঠা সর্বোচ্চ সীমা। এই সত্যটিই সেই কথাটিকে অপসারণ করতে সক্ষম। যেখানে বলা হয়েছে যে একজন ইতালীয় জেরোমিমো ভেরোসে তাজমহলের নির্মাণশিল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্য যেসব স্থপতির কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন লাহোরের স্থপতি উস্তাদ ইসা এফেন্দি ও উস্তাদ আহমাদ। তাজমহলের নির্মাণ কার্য সম্বন্ধে যে বিশদ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে শাহজাহান তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সমিতি গঠন করেছিলেন এবং নকশা প্রস্তুতকারীরা তাঁদের পরিকল্পনা কাগজে-কলমে বাদশাহকে নিবেদন করতেন। এই সমাধি সম্বন্ধে শাহজাহানের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা ছিল তাই তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাবও রাখতে সক্ষম হন। উভয়ের মতামতের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি কাষ্ঠ-নির্মিত নমুনা প্রস্তুত হয়। এবং সর্বসম্মত যে কাঠের নমুনা, তার ভিত্তিতেই এই প্রস্তারনির্মিত সমাধি ভবনের নির্মাণ শুরু হয়।

তাহলে এর থেকে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় যে মুঘল চিত্রকলার মতো তাজমহলের পরিকল্পনাও ব্যক্তিগত ভাবে বা একক ভাবে, কেউ করেননি। এটি ছিল একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এইভাবেই জানা গেছে যে আমানত খান শিরাজী ছিলেন হস্তলিপি শিল্পী, এবং ইসমাইল খান গম্বুজ নির্মাতা। আমরা ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে সহমত হতে পারি যে 'তাজ' 'ভারতীয় শিল্পচেতনা থেকে উদ্ভূত একটি জৈব উত্থান। বা ভারতীয় শিল্পচেতনার একটি জীবন্ত প্রকাশ। তাজ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বা কোনো একক উদ্ভাবকের সৃষ্টিও নয়। তাজ শিল্পসৃষ্টির এক মহান পরম্পরের চূড়ান্ত উৎকর্ষ।'

শাহজাহানের সময় মসজিদ নির্মাণও এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। তাঁর স্থাপিত সবথেকে লক্ষণীয় দুটি মসজিদ হল আগ্রা দুর্গের সন্নিকটে তাজমহলের মতো শ্বেতপাথরে নির্মিত মোতি মসজিদ এবং দিল্লির লাল বালিপাথরের তৈরি জামা মসজিদ। জামা মসজিদের বিশিষ্ট অঙ্গ বলতে এর সুউচ্চ তোরণ, দীর্ঘ পেলব মিনার-সমূহ এবং অনেকগুলি গম্বুজের সমাহারের করা উল্লেখ করা যায়।

শাহজাহানের নির্মিত দিল্লির লালকেল্লা যেমন তার রঙমহলের জাল দেওয়া বিচারের দাঁড়িপাল্লার জন্য বিখ্যাত, তেমনি স্থাপত্যগত ভাবে সমতল ছাদ যুক্ত *দিওয়ান-ই-আম-ই* সর্বাপেক্ষা চিত্তকর্ষক, যেখানে হিন্দু স্তম্ভস্থপতির সবটুকু নৈপুণ্য ব্যবহার করে যাতে সিংহাসন থেকে পরিষ্কার ভাবে স্তম্ভের মধ্য দিয়ে সব কিছু

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিগোচর হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু পত্র সুশোভিত খিলানগুলি ঢেউ খেলানো জলের ধারণা সৃষ্টি করে।

এইভাবে আমরা শাহজাহানের লালকেল্লার প্রাসদগুলিতে ধনুকের মতো বক্রাকার এবং trabeate উভয় ধরনের স্থাপত্য দেখতে পাই।

যদিও অর্থব্যয় সম্বন্ধে সচতেন ঔরঙ্গজেব খুব বেশি প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। কিন্তু হিন্দু এবং তুর্ক-ইরানি শিল্পকলার মিশ্রণ-ভিত্তিক মুঘল স্থাপত্যের পরম্পরা নানা অলংকরণে সুশোভিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এইভাবে বহু প্রাদেশিক এবং স্থানীয় রাজ্যের প্রাসাদ এবং দুর্গগুলিতে এই মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি শিখদের হরমন্দির বা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির যা এই সময়কালে বহুবার পুনর্নির্মিত হয়, তাও মুঘলদের খিলান ও গম্বুজশৈলীর উপরে গঠিত এবং এর মধ্যে মুঘল স্থাপত্যের আরও বহু চিহ্ন দেখা যায়। এখানে যা লক্ষণীয় যে এই স্থাপত্যগুলিতে কিছু হিন্দু শৈলী এবং কিছু ইসলাম শৈলী থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়নি। শাসকেরা যে সমস্ত অনুষঙ্গকে কার্যকরী এবং শিল্পসম্মত মনে করেছেন সেইগুলিকেই ব্যবহার করেছেন। তাঁদের সৌন্দর্যবোধ এবং ভারতীয় কারুশিল্পের দক্ষতা উভয় মিলে যে সম্মিলিত ধারার সৃষ্টি করেছিল তা ছিল একাধারে লাবণ্যময় এবং দৃষ্টি মুগ্ধকর।

Scanned with CamScanner